ধুলোদের ভিড়ে এক আর্কেয়োপট্রিক্স পাখি

লিখেছেন - নাজমুস সাকিব অনিক

06/03/2016 1:59AM

গত আধা ঘন্টায় বাসটা কয়েক ইঞ্চি এগিয়েছে বোধহয়। সাত সকালেই মারাত্মক যানজট। আমার পাশে বসে মোটা গ্লাসের চশমা পরা যে মেয়েটা উচ্ছ্বাসী দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে নগরীর বিরক্তিকরভাবে বেড়ে ওঠা ব্যাস্ততা গভীর মনোযোগ সহকারে দেখছে তার নাম অপ্সরা। এমনিতে মেয়েটা সারাক্ষন জগতের সমস্ত ব্যাপার নিয়ে বিরক্ত থাকে। মহাজগতের সৃষ্টির রহস্য ছাড়া কিছুই তাকে আকর্ষণ করে না। আজকের ব্যাপারটা আলাদা। মেয়েটা ঘন্টা কয়েকের মধ্যে আমার প্রেমিকা থেকে বিয়ে করা বউ হয়ে যাবে। আমরা পালিয়ে বিয়ে করছি। অন্যরকম ব্যাপার স্যাপার।

মাঝপথ থেকে গল্প বলাটা পেশাদারিত্বের পরিচয় না। ঘটনাটা প্রথম থেকে বলি। সাড়ে ছ’বছর আগের ঘটনা। ক্লাস টেনে পড়ি। থুতনিতে দাঁড়ি আর কাঁধে পাখা গজানো শুরু করেছে। কারণ ছাড়াই মনটা উদাস হয়ে থাকে সারাদিন। আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখি, বিছানায় শুয়ে সারাদিন কি যেন ভাবি। পাড়ার মাঠে পোলাপানকে ক্রিকেট খেলতে দেখে কাঁধ ঝাকিয়ে মনে মনে ভাবি, “ বাচ্চাগুলা...”। তবে মনের গভীরে সবসময় একটা বিশেষ চিন্তায় চিন্তিত থাকতাম। স্কুলের বন্ধুগুলা সব মেয়েবন্ধু জুটিয়ে ফেলল। স্কুল শেষে ছেলেমেয়েগুলো হাত ধরাধরি করে কোথায় যেন চলে যায়। আমি একা একা বাড়ি ফিরি। আফসোসের অন্ত নাই।

সেবার কোরবানীর ঈদে একটা ঘটনা ঘটল। কোন এক বিকালে কোচিং শেষে বিশাল গতিতে সাইকেল ছুটিয়ে বাইকের একটা আমেজ এনে বাসায় ফিরছি। হঠাৎ পাশের বাড়ির বারান্দায় এক মেয়েকে দেখে চোখ আটকে গেল। অদ্ভূত ফর্সা হাড় জিরজিরে একটা মেয়ে গোসলের পর চুল শুকাচ্ছে। কিন্তু এ বাসায় তো কোন মেয়ে থাকার কথা না। দশম শ্রেনীর হাহাকাররত মন। বুদ্ধি খেলিয়ে দিল চকিতে। পাড়ার ছোট ছোট গুপ্ত এজেন্টের কোন অভাব নাই। জানতে পারলাম পাশের বাসার শরাফত আলী সাহেবের নাতনী। ঢাকা থাকে। ভিকারুন্নেসা নুন নামের কোন এক বিখ্যাত স্কুলে লেখাপড়া করে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো মেয়েটা দশম শ্রেনীতে পড়ে।

তো হঠাৎ করেই সে ঈদে আমার টেবিল পুরুষালি কসমেটিক্সে ভরে গেল। আয়নার সামনে পকেটে হাত দিয়ে কাটানো সময়ের পরিমানও আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেল। একদিন হঠাৎ দেখি বাসায় মেয়েটার আম্মু এসে উপস্থিত। আন্টি আবার অসম্ভব সুন্দরী। আমারই তাকাতে কেমন লজ্জা লজ্জা করে। আন্টি আমার পিতৃদেবকে খোঁজেন। ছোটবেলায় হারিয়ে যাওয়া বন্ধু-বান্ধবী। আমার গম্ভীর পিতৃদেব কেন জানি উনাকে দেখে হঠাৎ বিশাল দিলখোলা হয়ে ওঠেন। আমার হাত ধরে টানাটানি করে বলেন, “সিয়াম তোর আসমা আন্টি। চিনিস তো ? আমরা একই স্কুলে পড়তাম” বলে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে দেন। তো আব্বা এবং আন্টির এই হারিয়ে যাওয়া পুরনো দিনের বন্ধুত্বের সুবাদে আন্টির মেয়ের সাথে মুখোমুখি সাক্ষাত অনেকটা সহজ হয়ে যায়। পিতৃদেব খুশি থাকেন, আমি খুশি থাকি। আমার আম্মা শুধু ভ্রু কুঁচকে একবার আমাকে দেখেন, আরেকবার আব্বাকে দেখেন। রান্নাঘরে গরম তেলে মাছ ছেড়ে দিয়ে গলার ঘাম আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে বিড়বিড় করে বলেন, “ আমি তো অশিক্ষিত, ইন্টার পাশ। আমার দিকে তাকানোর সময় তো নাই। বিয়ে করতে বলছিল কে অশিক্ষিত মেয়েকে ?”

সে যাই হোক, আম্মার রাগে ভরপুর সুস্বাদু মাছভাজা খেয়ে দিনকাল বাপ-বেটার ভালোই যায়।

২।

অদ্ভূত ফর্সা হাড় জিরজিরে যে মেয়েটা, যে আবার মোটা গ্লাসের চশমাও পরে, তার নাম অপ্সরা। মেয়েটা খুবই আঁতেল গোছের। সারাদিন পড়াশোনা করে। ঈদের ছুটিতে নানুবাড়ি এসেছে তাও জীববিজ্ঞান বই সাথে নিয়ে। কুনোব্যাঙ চ্যাপ্টারের অবজেকটিভগুলো আবার খতম দিবে। তো যে মেয়ে এক সপ্তাহে কুনোব্যাঙ চ্যাপ্টারের সমস্ত অবজেকটিভ খতম দেয়ার উদ্দেশ্যে ছুটিতে এসেছে তার সাথে আলাপ জমানো কঠিন। অনেক ঘুরঘুর করার পর সুযোগ মিলে ঈদের দিন সন্ধ্যায়। তাদের বাসায় আমাদের স্বপরিবারে দাওয়াত। আমি আমার প্রেমিক পুরুষ বন্ধুবর কামরুল, যে কিনা ইতিমধ্যেই তিনটা প্রেম করে স্কুলে সাড়া ফেলে দিয়েছে, তার সাথে আগেই শলাপরামর্শ করেছি। বন্ধু বলেছে , “ মিয়া টাইম কম। একশান হইতে হইব ধর, মার, কাট”।

সফল প্রেমিক বন্ধুর পরামর্শে আমি সেদিন সন্ধ্যায় এক সুযোগে অপ্সরাকে “ধর, মার, কাট” স্টাইলে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে দিলাম। মেয়েটা মোটা চশমার পিছন থেকে ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ খুব বোঝার ভান করে বলল “ও...না”।

আমি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। এটা কি হলো ? এটা তো হবার কথা না। কাউয়া সদৃশ কামরুল পরীর মত তিনটা মেয়ের সাথে প্রেম করে যারা কিনা আবার গা শিউরানো ভাষায় তাকে চিঠিও লিখে। আমি একটা আঁতেল মেয়ের কাছে ধরা খেয়ে গেলাম ! ইচ্ছে হলো মাটি ফুঁড়ে “সেন্টার অফ দি আর্থ” এ চলে যাই।

ওদের বাসা থেকে বেরিয়ে আসার আগ দিয়ে দেখলাম মেয়ে গভীর মনোযোগের সাথে কুনোব্যাঙ চ্যাপ্টার পড়ছে। কোন ভাবলেশ নাই।

ব্যার্থ প্রেমের ঘটনা সফল প্রেমের ঘটনার চেয়ে কয়েকগুন দ্রুত ছড়ায়। আমারটা পাড়ার পিচ্চি ব্যাটেলিয়নের কল্যানে দাবানলের মত ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে ঘটনা অকপটে স্বীকার করে। প্রতিবেশী চাচারা দেখা হলে আমার দিকে ক্রুর দৃষ্টিতে তাকান। কেউ আবার দুয়েকটা বড়মানুষী রসিকতা করেন কাছে ডেকে। পিতৃদেব-মাতৃদেব

ী সবসময় অগ্নিমূর্তি ধারণ করে থাকেন। এই দুঃসময়ে সঙ্গ দিল প্রেমিক বন্ধু কামরুল। বললো এগুলা কোন ব্যাপার না। মেয়ে শুকনা ছিল, শুকনা মেয়েতে কাজ নাই। “জাস্তি” মেয়ে মিস হয়ে গেলে মন খারাপ করার সুযোগ ছিল।

আমি সব ভুলে ভদ্র ছেলের মত এস এস সি নিয়ে সিরিয়াস হয়ে পড়লাম। পরীক্ষা ভাল হলো। বেশিই ভাল হলো আমার মানের তুলনায়। গোল্ডেন পেয়ে গেলাম। ঢাকা গেলাম। ভর্তি পরীক্ষা দিলাম। নটরডেম কলেজে চান্স পেয়ে গেলাম। স্বপ্নের মত কাটল তিনটা মাস। পাড়ায় হঠাৎ করে আদর্শ ছেলে হয়ে গেলাম। যেসব চাচারা আমাকে দেখে ভ্রু কুঁচকাতেন, তিন মাসের ব্যাবধানে তারা ছেলেমেয়ের কাছে আমাকে উদাহরণ দিয়ে উপদেশ দেয়া শুরু করলেন। বোর্ড পরীক্ষার রেজাল্ট সবসময় মানুষের জীবন আকাশ-পাতাল পার্থক্য গড়ে দেয়।

৩।

মামা চাচার বাসায় দীর্ঘমেয়াদকাল থাকা ঝামেলার একটা ব্যাপার। একটা পরিবারের ভিতর নিজেকে অনাহুত মনে হয়। নিজের কাছেই নিজেকে ছোট লাগে। দু’মাসের মাথায় তল্পিতল্পা নিয়ে শিফট হয়ে গেলাম। মামীর মেকি কান্নায় সারাটাদিন ঘর ভারী হয়ে থাকল। যা হোক, জীবনে প্রথমবারের মত অবাধভাবে স্বাধীনতা পেয়ে গেলাম। খাই দাই, ঘুমাই, ঘুরাঘুরি করি। বাসা থেকে ফোন দিলে গ্যালন গ্যালন অমায়িক ভদ্রতা ঢেলে দেই ফোনের ভিতর দিয়ে। কলেজে যাই, যাই না। কোনদিন খাই, খাই না। ঘুমাইলে উঠি, উঠি না। কলেজের দিকে রওনা হলেও মাঝে মাঝেই পথ ভুলে (!) আরামবাগের বদলে বেইলি রোড চলে যাই। সুন্দরী দেখে ভরাট হৃদয় নিয়ে বিকালবেলা সিটিবাসে ঝুলতে ঝুলতে ঘরে ফিরে আসি। ভালই চলছিল। তবে হাশরের ময়দানের মত যে মাঝে মাঝে ছাত্রজীবনের কর্মফল ঘোষনা করা হয় সেখানে ধরা খেয়ে গেলাম। মিডটার্মে তিন বিষয়ে ফেল।

আমি মোটামুটি বুদ্ধিমান ছেলে। সবসময় গড়পড়তায় থাকি। খুব ভালোও না, খুব খারাপও না। মাঝের দিকে থাকি। নিরাপদ জোন। রেজাল্টটা টেনে আবার নিরাপদ জোনে আনা লাগবে। নিয়মিত কলেজ যাওয়া শুরু করলাম। কমবেশি পড়ালেখাও শুরু করলাম।

তখন ছিল শীত আসি আসি একটা সময়। সকাল থেকেই টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। সিটিবাসের ২০ টাকার টিকেট কিনে অপেক্ষা করছিলাম বাসের জন্য। হঠাৎ করে কেন জানি মনে হলো একটা পরিচিত অবয়ব। তাকিয়ে দেখি চেনা মুখের একটা হাড় জিরজিরে চশমা পরা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার উজ্জ্বলতায় আশেপাশের সবাইকে ঘানা প্রোডাকশন মনে হচ্ছে। টিস্যু দিয়ে নাক মুছতে মুছতে নাক লাল করে দাঁড়িয়ে আছে।কেমন জানি একটা অনুভূতি হলো ওকে দেখে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় পালানোর তাগিদ দিল। কিন্তু তার আগেই মেয়েটার মাইক্রোস্কোপিক চশমায় ধরা পড়ে গেলাম।

-এই ছেলে শুনো।

অনিশ্চিত পায়ে এগিয়ে গেলাম।

-তুমি তো সিয়াম, না?

-হ্যাঁ। মাথা নীচু করে জবাব দিলাম।

-এখানে কি করো ?

ইচ্ছা হলো বলি “বেড়াতে আসছি। তোমাদের ঢাকায়”। মেয়ে ভাবে কি আসলে নিজেকে ? হাতে আবার দেখি বই দেখা যায়। পুরাই আঁতেল। ইচ্ছা হলো জিজ্ঞাসা করি ঢাকা বোর্ডে “কুনোব্যাঙ” চ্যাপ্টার থেকে কয়টা অবজেকটিভ এসেছিল। সমস্ত রাগ চেপে বললাম-

-কলেজ যাই।

-ও, কোথায় পড় তুমি?

-নটরডেম।

-ও আচ্ছা। জানতামই না।

-হুম, তুমি কোথায় পড়?

- কেন ভিকারুন্নেসায়, জানতে না ?

-ও আচ্ছা ঐটা। হ্যাঁ ভাল কলেজ।

মেয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আড়চোখে তাকালো আমার দিকে। আঁতেল মানুষজনকে খোঁচানো খুব সোজা।

-তো তোমরা তাহলে মোহাম্মদপুর থাকো ?

-হুম, হাউজিং সোসাইটি। তুমি?

- এইতো তাজমহল রোডে একটা মেসে থাকি।

- মেসে থাকো কেন?

- আমার যে বাড়ি নাই এইখানে তাই।

-ও আচ্ছা। খুব বোঝার ভঙ্গিতে বলল।

জানা গেল সে বাস মিস করেছে। সারারাত যে কুইজটার জন্য পড়েছে সেটা এতক্ষনে শেষ হয়ে গেছে। এখন তাই হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে নাক মুছতে মুছতে লাল বানাচ্ছে। “আসলে জীবনটাই যে এরকম, যা চাই তা সবসময় হয় না” এই মর্মে একটা জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখতে যাচ্ছিলাম। এমতাবস্থায় মেয়েটা বাঁধা দিল।

-আমি তো আজ কলেজ যাব না। মনটা ভাল না। তুমি আমার সাথে একটু হাঁটবা?

প্রশন শুনে হঠাৎ যেন আমার নাক উঁচু হয়ে সপ্তম আসমানে চলে গেল।

-না। আমার কুইজ আছে। আমি তো কলেজ যাব।

-ও আচ্ছা। ঠিক আছে। পরে দেখা হবে তাহলে।

বিব্রত ভঙ্গিতে মেয়েটা বলে উলটা ঘুরে আস্তে আস্তে চলে গেল। আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম ঘটনাটা আমি ঠিক কি ঘটালাম ? ইচ্ছে হলো চিৎকার করে ডেকে বলি “ঐ মেয়ে আরেকবার বলো, বুঝি নাই”। হঠাৎ মনে হলো ডারউইন সাহেব যদি সেকালে আমাকে নিয়ে গবেষনা করতেন তবে বিজ্ঞান আজ অন্যরকম হতো। তিনি তার বিখ্যাত “The Origin Of Species” বইতে লিখতেন “ মানুষ গাধার বিবর্তিত রুপ”।

অপ্সরার সাথে এরপর থেকে কেন জানি প্রায়ই কাকতালীয়ভাবে টাউনহল মোড় কিংবা বাসস্ট্যান্ডে দেখা হয়। আসলে কাকতাল বলাটা ঠিক হবে না। কাক যদি তাল পড়ার আগ পর্যন্ত উড়ে না গিয়ে গাছে বসেই থাকে তাহলে তো সমস্যা। যা হোক, আমার হাজার রাকাত নফল নামাজ পড়া দোয়া সত্ত্বেও মেয়েটা আর কোনদিনই কুইজ মিস করল না, কোনদিনই না।

৪।

দিন যেতে থাকে। বাসস্ট্যান্ড থেকে আমার আনাগোনা তার বাসা পর্যন্ত গড়ায়। ওর বাসায় সবচেয়ে অবাক করার জায়গা ওর রিডিং রুম টা। এই কলোনির বাসাগুলো সব রোবটিক। ম্যাচবক্সের মত রুম। মানুষ থাকাই ঝামেলার ব্যাপার ফ্ল্যাটে। তার মধ্যে সবচেয়ে সবচেয়ে বড় রুমটা হাজার হাজার বই দিয়ে ভর্তি করে রেখেছে। করে কি এগুলো দিয়ে আল্লাহ জানেন। এই বই ভান্ডারের যে কোন একটা বই পড়তেই আমার আজীবন লাগবে। পরে জেনে অবাক হয়েছিলাম যে এর আশি শতাংশ বই ওর পড়া। আন্টি একদিন বললেন মেয়ে নাকি ক্লাস টু থেকে মোটা মোটা বই পড়ে।

অপ্সরার সাথে ফোনে মাঝে মাঝেই কথা হতো। এমনকি গভীর রাতেও। সবই মেকানিক্স, প্রোবাবিলিটি অথবা টাইম ডাইলেশনের মত কঠিন কঠিন বিষয় নিয়ে। আজব ব্যাপার হলো আমি মেয়েটার কন্ঠ শুনতে ফোন দিতাম না। মেয়েটা বুঝায় খুব ভাল। মেয়েটার কল্যানেই হয়ত শিক্ষক, বন্ধু, পরিবার-পরিজন সর্বোপরি নিজেকে অবাক করে দিয়ে আবার গোল্ডেন হাঁকালাম। বাংলায় কিভাবে এ+ পেয়েছিলাম সেটা আজও রহস্য। অপ্সরা মেয়েটা ঢাকা বোর্ডে পঞ্চম হয়েছিল।

দুজনেই একসাথে বুয়েট কোচিং এ ভর্তি হয়েছিলাম।ভালই কোচিং করলাম। মেয়েটা সবসময় মডেল টেস্টে হাজার হাজার স্টুডেন্ট এর ভিতর প্রথম দশে থাকত। সমস্যা হয়ে গেল ভর্তি পরীক্ষার দিন সকালে। মেয়েটা কোন এক উপায়ে প্রবেশপত্র হারিয়ে ফেলল। বুয়েটে তার পরীক্ষা দেয়া হলো না। আর আমি যেন দিয়েও দিতে পারলাম না। পরীক্ষার হলে চেনা প্রশ্নগুলো অচেনা লাগল।

মেডিকেল লাইন অনেক ঝামেলা। আজীবন পড়ালেখা করার ইচ্ছা আমার ছিল না। আপ্সরার যুক্তি আলাদা। তার মতে মেডিকেল শিক্ষাব্যাবস্থা ছাত্রছাত্রীর ক্রিয়েটিভিটি নষ্ট করে দেয়। আমি বুঝি না এত। ক্রিয়েটিভিটি কি জিনিস? দু’জনেরই শেষ পর্যন্ত ঠিকানা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অপ্সরা ‘ক’ ইউনিটে দ্বিতীয় হয়ে জেনেটিক্স নেয়। আমি টেনেটুনে হাঁচড়ে পাচড়ে মাঝের দিকের একটা সাবজেক্টে ঝুলে পড়তে সক্ষম হই। আমাদের “বড় হয়ে যাওয়া” জীবনের শুরু হয়।

একটা ব্যাপার বলা হয়নি। আমি এর মাঝে বিভিন্ন সুযোগে বিভিন্ন উপায়ে মেয়েকে পাঁচ সাতবার প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে ফেলেছি। মেয়েটার প্রতিক্রিয়া প্রতিবার একই থাকে। ভ্রু কুঁচকে চশমার নীচ দিয়ে হালকা বিরক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে “ ও...না”।

৫।

ভার্সিটি জীবনের তৃতীয় মাস পর্যন্ত রবার্ট ব্রুস সাহেবকে গুরু মানতাম। গুরু অষ্টমবারে রাজ্য পূনর্দখলে সক্ষম হয়েছিলেন। ভার্সিটির তৃতীয় মাসে টি,এস,সির এক কোনায় হাড় জিরজিরে রমনীর কাছে অষ্টমবার প্রত্যাখ্যাত হবার পর আমি রবার্ট ব্রুসের থেকেও মহান ব্যক্তিত্ব। তাকে আর গুরু মানা অর্থহীন। সিদ্ধান্ত নিলাম কবি কালিপ্রসন্ন ঘোষ দাদার উপদেশ মানবো। একশবার চেষ্টা করে দেখি, কি হয়।

ম্যাচিওরিটি ব্যাপারটা যত বেড়েছে, দিন দিন তত বিচিত্র উপায়ে প্রপোজ করেছি। মেয়েটা অবশ্য সেই পুরনো উপায়ে প্রতিবারই ভ্রু কুঁচকে বলেছে “ও...না”। কিন্তু একটা ব্যাপার ছিল। মেয়েটা আর কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখাত না। আমাদের ছাত্র-শিক্ষিকা সম্পর্কে কোন প্রভাব পড়তো না। এই ব্যাপারটাই হয়ত আমাকে রবার্ট ব্রুসের থেকেও মহান হতে সাহায্য করেছে।

সময় ঘুরে আরেকটা ঈদ এল। অপ্সরারা আরেকবার তার নানুবাড়িতে ঈদ করতে এল। ওর নানা শরাফত আলী সাহেব এলাকার বিশিষ্ট ধনী। বাড়ির পিছনে গাছপালা ঘেরা একটা বিশাল শানবাঁধানো পুকুর আছে। আমরা মফস্বলের লোকেরা নিজেদেরকে শহুরে ভাবতে ভালোবাসি। শরাফত আলী সাহেব নিয়ম থেকে বেরিয়ে তার বাড়িতে একটা গ্রাম গ্রাম ভাব টিকিয়ে রেখেছেন। বিশেষ করে পুকুরপাড় টা। ওখানে গেলেই একটা শান্তি শান্তি ভাব কাজ করে মনে। অপ্সরা বিকালের দিকটা শানবাঁধানো ঘাটে বসে মোটা মোটা গল্পের বই পড়তো।

পূর্বের অন্যান্য চেষ্টার মত সেদিনও একটা প্রচেষ্টা চালালাম। অনেক খুঁজে খুঁজে এলাকার ১০ টা অনূর্ধ্ব-৩ বয়সের একটা দল প্রস্তুত করে সদলবলে শিক্ষিকার পাঠ্যস্থানে হামলা করলাম। সবার হাতে একটা করে গোলাপ। একে একে দেবশিশুরা অপ্সরার কাছে যায়। ছোট হাতে ফুল বাড়িয়ে দিয়ে “তোমাকে বালোবাতি (ভালোবাসি)” বলে ফিরে আসে। এসে আমার হাত থেকে চকলেট বুঝে নেয়। সব শেষে আমি আমার দশ মাসের বোনের ছেলেকে নিয়ে হাজির হই। এটা আমার টিমের স্রাইকার। তাকে তিনদিন ধরে ফুল বাড়িয়ে দেয়ার প্রশিক্ষন দেয়া হয়েছে। ব্যাটা আবার টুকটাক গানও গায় আজকাল। সময়মত গাইলে তো ভালই। নাটক সিনেমায় দেখেছি গান গেলে নায়িকা পটে যায়। পিচ্চিকে কোলে নিয়ে নায়িকার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। নায়িকা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার বহুদিনের অভ্যাস। সমস্যা হলো না। বলে ফেললাম “তোমাকে ভালবাসি”। সমস্যাটা হলো এরপর। আমার স্ট্রাইকার ফুল বাড়িয়ে দেয়ার বদলে মুখে নিয়ে চাবাতে শুরু করলো। হাত থেকে গোলাপ কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করতে আরো বিপত্তি। তারস্বরে চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। অনেক চেষ্টা করেও থামাতে পারছিলাম না। অপ্সরা ওকে আমার কোল থেকে নিয়ে নিল। আমাকে অবাক করে দিয়ে বিশ্বাসঘাতক ২০ সেকেন্ডের মধ্যে কান্না থামিয়ে ভেজা চোখে হাসতে শুরু করল। চোখে মুখে লুলামি। মেয়ের কোলে উঠে হাসতে শুরু করেছে। ভবিষ্যতে কঠিন লুল হবে সন্দেহ নাই। যা হোক, অপ্সরা আমার দিকে তাকিয়ে বলল

-তোমার অভিযান শেষ?

-হুম। মাথা নীচু করে জবাব দিলাম।

-তোমাকে আর চেষ্টা করতে হবে না।

-না, ঠিক আছে।

-না আবার কি? বুঝোনি? আর চেষ্টা করতে হবে না।

একটু যেন হাসির রেখা দেখলাম ওর ঠোঁটে। বুকটা ধক করে উঠল।

-তাহলে কিছু বলো’’। আমার ধুকপুকানি বেড়েই চলেছে। মেয়েটা এখনো “ও...না” বলেনি।

-কি বলবো ? ঘাড় ঘুরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসির রেখাটা প্রসারিত করে বললো। আমার বুকের ভিতর আর্মির পাসিং আউট প্যারেডের ব্যান্ড দল সজোরে ড্রামস বাজিয়ে চলেছে।

-কিছু একটা বলো।

-ধুর যন্ত্রনা। বলে ভাগ্নেকে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে পালালো। ওর মুখের লালাভ আভাটা দেখে ফেললাম।

ভাগ্নে গম্ভীর হয়ে একবার আমাকে দেখে, একবার অপ্সরাকে দেখে। ব্যাটা সব বুঝতেছে নাকি ! আজকাল পোলাপানকে আন্ডারএস্টিমেট করার সুযোগ নাই। আজকাল টিভিতে গর্ভনিরোধকের বিজ্ঞাপন দেখালে পোলাপান চুপ করে অন্যদিকে তাকিয়ে বসে থাকে। আমাদের জমানার পোলাপান মামা-চাচার ঠ্যাং ধরে ঝুলে পড়তাম “এইটা কি? এইটা কি?” বলতে বলতে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার যুদ্ধ জয় শেষে বিজয়ী দল নিয়ে বিজয় হুংকার করতে করতে ঘরে ফিরছিলাম। মাঝপথে বিজয়ী দলের স্ট্রাইকার বিজয়ানন্দের বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে আমার কোলে হিসু করে দিল। দিয়েই বুঝতে পারল ব্যাপারটা করা ঠিক হয় নাই। তারপর গভীর আবেগে আমার কাধে মাথা গুজে সুর করে কান্না শুরু করলো। জীবনে প্রথমবারের মত এরকম কাজের পরেও বাচ্চা প্রজাতির প্রতি আমার মায়া জন্মালো। মায়ার চোটে ভাগ্নের গালে একটা চুমুও খেয়ে বসলাম। হাজার হলেও জয়ের নায়ক এই ব্যাটাই।

৬।

প্রেম হবার পর আমাদের সম্পর্কটা প্রেমিক-প্রেমিকা এবং ছাত্র-শিক্ষিকার অদ্ভূত সংমিশ্রণে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেল। একদিন পূর্নিমা রাতে বিশাল বড় রূপালি চাঁদ দেখে আবেগে গলে গিয়ে বলেছিলাম, “তুমি আমার চাঁদের বুড়ি”। মেয়েটা আমাকে চাঁদের কন্যা চিয়াং-এর গল্প শুনিয়ে দিল। যে মেয়েটা অমরত্ব লাভের লোভে তার প্রেমিককে নিয়ে অমৃত বেশি করে খেয়ে ফেলেছিল। ছেলেটা অমরত্ব হারিয়ে কোমায় চলে যায়। চাঁদকন্যা চিয়াং-এ প্রায়শ্চিত্য করতে চাঁদে বসে তার ভালোবাসাকে পাহারা দেয়। আজো দিচ্ছে। চাইনিজ রুপকথা।

আরেকদিন বলেছিলাম আমি তার জন্য মজনুর মত মারা যেতে পারি। সে মিশরের রাজকুমার, পৃথিবী আর আকাশের দেবতা ইসিরিসের কথা বলে। অন্ধকারের দেবতা যাকে কেটে মহাবিশ্বের চৌদ্দ কোনায় লুকিয়ে রেখেছিল। ইসিরিসের প্রেমিকা, চাঁদ ও বৃষ্টির দেবী ইসিস কয়েকশত বছর খুঁজে সেই চৌদ্দ খন্ড এক করে ইসিরিসকে জীবিত করে তোলে। অন্ধকারের দেবতা ক্ষমতা হারায়। অপ্সরা আমাকে ইসিসের মত বাঁচাতে চায়। আমাকে এখন চৌদ্দ খন্ড হতে হবে।

আরেকবার কোন এক আবেগী মুহূর্তে বলেছিলাম, “তুমি আমার পাখি”। যুক্তিবাদী নারীর প্রশ্ন, “কি পাখি?”। আমি এমনিতে কাক-শালিক বাদে পাখি চিনিনা। বহুত ভেবে বললাম “চড়ুই পাখি”। কিন্তু হবে না। সে বলল সে আর্কেয়োপ্ট্রিক্স পাখি হতে চায়। এটা কোন ওষুধের নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে জানায় যে “আর্কেয়োপট্রিক্স পৃথিবীর প্রথম পাখি। ১৫০ মিলিয়ন বছর আগে এরা ছিল। বর্তমান উত্তর জার্মান এলাকায়। পাখিগুলার পাখায় অনেক জোর ছিল। আমি তোমার আর্কেয়োপট্রিক্স পাখি”। কি আর করা। জেনাস-স্পেসিস সহ বৈজ্ঞানিক নাম মুখস্ত করে মেনে নিলাম, সে আমার আর্কেয়োপট্রিক্স পাখি।

কন্যার আবেগের লেভেল আর আমার আবেগের লেভেল মিলে না। আমি রাস্তাঘাটে মানুষজনের চিল্লাপাল্লা দেখি, আর সে জীবজগতের রহস্য নিয়ে ভাবে। তাই বেশিরভাগ সময়ই চুপ করে থাকতাম সায়েন্টিফিক নাম মুখস্ত করার ভয়ে। আমার একটা স্বভাব ছিল। ওর চশমা খুলে নিতাম মাঝে মাঝে। মেয়েটার চশমার পাওয়ার মাইনাস পাইভ ডায়োপ্টার। চশমা ছাড়া কিছুই দেখে না প্রায়। কিন্তু ওর চোখজোড়া অসম্ভব সুন্দর। চশমার আড়ালে সবসময় লুকিয়ে রাখার ব্যাবস্থা করে দিয়েছেন বিধাতা। না হয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে যুবসমাজ ধ্ব্বংসের মুখে পতিত হত। চশমা খুলে নেবার পর ও উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক ওদিক তাকাতো অসহায়ের মত। অনেক্ষন কাড়াকাড়ি করত। শেষে না পেরে হাত গুটিয়ে বিষন্ন মুখে বসে থাকত। আমি ওকে দেখতাম। অসহায় মুখটা দেখতাম। একবার একটা ঘটনা ঘটল। সেদিন চশমা নিয়ে ফাজলামোটা বেশিই করে ফেলেছিলাম। ও হঠাৎ আমার শার্টের হাতা টেনে ধরে চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলেছিল, “ আমি তোমাকে দেখতে পাই না তো...তোমাকে দেখতে পাই না”।

সেদিন ইচ্ছা হয়েছিল আমার ৬/৬ চোখের সমস্ত দৃষ্টিক্ষমতা ওকে দিয়ে দেই। ও দুনিয়াটা রঙ্গীন দেখুক।

৭।

আধা কোঁকড়ানো চুলের মেয়েটা আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে গেছে। চশমাটা খুলে পড়ে যাচ্ছে। মেয়েটা পরম নির্ভরতার সাথে আমার বাহু জড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। এত বেশি নির্ভরতা দেখে কেন জানি আমার ভয় লাগে। আমি ওর চশমাটা খুলে আমার পকেটে রাখি। বলা হয়নি, আমার আবার কিঞ্চিত হাতটানের অভ্যাস আছে। আমি প্রায়ই ওর চশমা, ক্লিপ, হেডফোন, পেন্সিল ইত্যাদি চুরি করি। সবচেয়ে বেশি আছে চশমা। প্রতিটা মডেলের একটা করে ভার্শন। চুরি করা সমস্ত জিনিস আমি একটা ছোট কাঠের বাক্সে রাখি। কক্সবাজার থেকে কিনেছিলাম। মেয়েটা জানে সম্ভবত আমার এই স্বভাবের কথা। ঘুম ভেঙ্গে সে নির্লিপ্তভাবে ব্যাগ থেকে আরেকটা চশমা বের করে পরবে।

ঢাকার মোড়ে মোড়ে কাজি অফিস। তবুও তিন ঘন্টার রাস্তা পাড়ি দিয়ে উত্তরা আসা ওর কারনে। ওর কোন এক বান্ধবীর নাকি বাড়ি এখানে। বাসা থেকে যত দূরে হয় তত নাকি ভাল। প্রেমের এক সপ্তাহের মাথায় মেয়েটা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল বাবা-মা যদি মেনে না নেয়? আমি কালবিলম্ব না করে বলেছিলাম পালিয়ে বিয়ে করব। ব্যাপারটা নিয়ে তখন অবশ্য সিরিয়াসলি ভাবি নি। নতুন প্রেমের মাঝে এত কিছু ভাবার সময় আছে ? আসলে ওর পরিবার আর আমার পরিবার আকাশ-পাতাল ব্যাপার স্যাপার। ওর পরিবারের শিকড় থেকেই মোগলাই ধনী। আমার বাপের দিন এনে দিন খাওয়া টাইপ ব্যাবসা। ওদের মুক্তমনা মনোভাবের কারনে হয়ত মিশতে সমস্যা ছিল না, কিন্তু বিয়ে কল্পনাতীত ব্যাপার। আমি বয়সে কিছুটা বড় হলেও সম্ভবনা ছিল। মেয়ের জন্য শয়ে শয়ে প্রস্তাব আসে। এবারের টা ফেরানো অসম্ভব। এমআইটি ফেরত ছেলে তাও আবার বাবার বন্ধুপুত্র। আমি তার কাছে যোগ্যতায় সরষে দানা। আমরা নিম্নমধ্যবিত্তরা বইয়ের হরফে পড়া বড় বড় কথা পড়ে বিশ্বাস করি যে অর্থ কোনকিছুর মাপকাঠি না। আসলে সমাজ আমাদের বিরাট ধোকার ভিতর রাখে। অর্থই সকল কিছুর মাপকাঠি। কলুষিত সমাজ থেকে বেরিয়ে তাই আমরা নিজেদের প্রতি সুবিচার করছি।

প্ল্যানটা হলো, আমরা বিয়ে করলাম, কেউ জানলো না। সময়মত প্রস্তাব পাঠিয়ে আনুষ্ঠানিক বিয়ে করবো। বাবা-মা রাজী না হলে তখন দৃশ্যপটে আমি এবং দলিল হাজির হবে। অনেক ঝামেলা হবে। দুই পরিবারের মানসম্মান নিয়ে টানাটানি হবে। কিন্তু সবশেষে সব বাবা মাই মেনে নেন। পাঠ্যপুস্তকের ব্যাপার স্যাপার।

ধুর, এসব মন খারাপ কথা ভেবে কাজ নাই। রাজকন্যার এই সুন্দর ঘুম ভাঙ্গাবো কি করে সে কথা ভাবছিলাম। পৌছে গেছি। সোনার কাঠি-রুপোর কাঠি লাগবে। রাজকন্যা অবশ্য নিজেই উঠলো। বান্ধবীকে ফোন দিল। তিনজন সাক্ষী রেডি আছে। বাস থেকে নামার সময় একটা অঘটন ঘটল। অপ্সরার বাম পায়ের স্যান্ডেলটা পচ্ করে ছিড়ে গেল। বিশাল যন্ত্রনা। ছেড়া স্যান্ডেল পরে বিয়ে করলে নাকি তার সংসারে অমঙ্গল হবে। এত জ্ঞানী একটা মেয়ে, এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করে। বাঙ্গালী নারীর কিছু ব্যাপার আছে। সে যতোই পাঙ্ক টাইপের হোক না কেন, কিছু কুসংস্কারে বিশ্বাস করবে এবং তার গভীরে কোন এক জায়গায় অসম্ভব মায়া লুকানো থাকবে। ব্যাপারটা আসলে ভালই লাগে। মা-খালাদের কথা মনে করিয়ে দেয়।

এখন রাজকুমারী তো খালিপায়ে হাটতে পারে না। আমার বিশালকায় স্যান্ডেল পায়ে চড়িয়ে বাচ্চাদের মত পা টেনে টেনে হাঁটতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে রিকশা নিলাম। স্যান্ডেল কিনতে হবে। সমস্যা হলো হঠাৎ করে কনের বাবা-মা কনে কে একনাগাড়ে ফোন দেয়া শুরু করল। আমি কনের নিটোল পায়ে একটা একটা করে স্যান্ডেল পরিয়ে পরখ করছি। কন্যা আজ বাঁ-পায়ে পায়েল পরেছে। সযতনে চুরি করে নিলাম। করা লাগতই।

বাবা-মা ফোন দিয়েই যাচ্ছে। অপ্সরা দরদর করে ঘামছে। আমি আড়চোখে ওকে দেখছি। ওর হাতজোড়া কাঁপছে। আমি ওর হাতজোড়া আমার মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরলাম। কাঁপাকাঁপি থামল না। বাড়তে লাগল। আমি শুকনো গলাটা ভিজিয়ে বললাম, “ আজ তো ঝামেলা হয়ে গেল। বিয়েটা কালকেও করা যাবে। আজ চলে যাই, না?” ও হুড়মুড় করে জবাব দিল, “কিন্তু ওরা (সাক্ষীরা) অপেক্ষা করছে যে?” আমি দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বললাম, “করুক”।

ও ফোন রিসিভ করে বাবা মা কে জানালো বান্ধবীর বাসায় আছে। ফিরতে সময় লাগবে। বাবা মা বকাঝকা করল বোধ হয়। ওর মুখটা চুপসে গেল। ফেরার পথে ও পুরোটা সময় আমার হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে বুকে চেপে বসে থাকল। আমি ওর দিকে একটা বারের জন্য তাকাতে পারি নি। আমার সাহস ছিল না।

অপ্সরাকে ওর বাসার রোড পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। অনেক্ষন দাঁড়িয়ে ছিল। মেয়েটার নাক ঘামছিল খুব। ছোটবেলায় আপুরা বলত যে মেয়ের নাক ঘামে তার স্বামী খুব সুখী হয়। ওর হাতটা ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না। যাবার মুহূর্তে মেয়েটা টেনে হিঁচড়ে আমার রিস্ট-ব্যান্ডটা খুলে নিয়ে গেল। ওর নখে লেগে আমার হাত কেটে গেল। জ্বলছে না, নাকি জ্বলছে। জ্বলুক, খুব জ্বলুক। ব্যাথাটা যেন মনে থাকে। মেয়েটা অনিশ্চিত পায়ে হেটে চলে যাচ্ছে। রাস্তায় ধুলোয় পদচ্ছাপ রেখে যাচ্ছে। আমার ইচ্ছে করে ওকে ঘিরে থাকা সমস্ত বাতাস বুকে বন্দী করে ফেলি। ওর রেখে যাওয়া পদচ্ছাপ পৃথিবীর বুক থেকে ছিনিয়ে নেই। আমার গায়ে রেখে যাওয়া ওর সুবাসটা আজীবন থাকুক। অপ্সরা হেঁটে যাচ্ছে। ওর চুলগুলো কেমন বুনো হিংস্রতার সাথে উড়ছে। কি সুন্দর মেয়েটা, কি অদ্ভূত সুন্দর ! আশ্চর্য ওকে কথাগুলো বলাই হয়নি। ও পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মেয়ে। চোখজোড়ার কথা জানানো হয় নি। অসম্ভব মায়াভরা চোখজোড়া নিয়ে মেয়েটা আমার থেকে পৃথিবীর উল্টোদিকে হেঁটে যাচ্ছে। কেউই মানি না, অথচ দুজনেই জানি আর সম্ভব না। খুব ইচ্ছে হলো ওর চোখজোড়া আরকবার দেখি, আর একটা বার। একবার ফিরে তাকাক। জানি তাকাবে না। ওর সে সাহস নেই। ওর দৃষ্টি বুকে ধারন করার ক্ষমতাও আমার নেই।

পাঠক, গল্পের নায়িকার পরদিনই এনগেজমেন্ট হয়। সপ্তাহদুয়েকের মাঝে বিয়ে হয়ে যায়। নায়ক বুকপকেটে বহুদিন নায়িকার শেষ পদচ্ছাপের ধুলো জমিয়ে ঘুরে বেড়ায়। নায়িকার সাথে নায়কের অনেক বছর পরে নগরীর এক ব্যস্ত ভিড়ে দেখা হয়। দেখা বললে ভুল হবে, নায়ক নায়িকাকে দেখতে পায়। অপ্সরা একটা ছোট বাচ্চার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখে সুখের ছোয়া ছিল। নায়কের বুকপকেটে জমানো ধুলোগুলো ততদিনে হৃদয়ে চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। নায়ক হঠাৎ করেই প্রাচীন আর্কেয়োপট্রিক্স পাখির মত হারিয়ে গিয়েছিল। আর যে নারীর মুখে সে হারিয়ে যাওয়ার আগে সুখের ছোয়া দেখেছিল সে এখন একজন ডিভোর্সী মহিলা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে তার জগত। আরেকটা সুপ্ত জগত আছে এক ছোট বাক্সে। যেখানে একটা শুকনো ঘামের গন্ধওয়ালা টি-শার্ট, দু’টা অর্ধখাওয়া সিগারেট, অসংখ্য রিস্ট-ব্যান্ড, একটা আধছেড়া ছবি, নয়টা শুকনো আর আর একটা আধচাবানো গোলাপে মিশে আছে অনেক স্মৃতি।

( প্রকাশকাল - ২০১২)

\*\* ২০১২ সালটা খুব খারাপ দেখেছি। কাছের মানুষদের সম্পর্কে শুধু ভাঙ্গন আর ভাঙ্গন। সম্পর্কের রসায়ন এত বুঝি না। খুব ইচ্ছা হয় সম্পর্কগুলো যদি অলৌকিকভাবে জোড়া লেগে যেত। সেইসব কাছের মানুষগুলোর জন্য...\*\*